Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 389–399
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সামাজের অন্তরালে বাস্তবের বহুকৌণিক দৃষ্টি

সঞ্চিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : sanchitasaha1995@gmail.com

Keyword
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারীদের অবস্থান, বেকারত্ব, শিশুশিক্ষা, জীবনবোধ গঠন, জীবসেবা, পশুপ্রেম

Abstract
মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার কর্মের প্রতিটি বিষয়ই সমাজের কোন না কোন দিকে ঢাকা থাকে আবার কখনও বা থাকে উন্মুক্ত। মানুষের তৈরি সাহিত্যও তার ব্যতিক্রমী নয়। সাহিত্যের যা কিছুই থাকুক না কেন, সেটা সমাজকে বাদ দিয়ে কখনো গড়ে ওঠেনি। সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ই হয়ে ওঠে সাহিত্যের সামগ্রী। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে তেমনি উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ। কখনো সেটা, সমাজের নারীর অবস্থান বিষয়ে, আবার কখনো দেখানো হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য, কখনো বেকারত্বের সমস্যা, শিশু শিক্ষার পাশাপাশি, শিশু কিশোরদের জীবনবোধ কিভাবে গড়ে উঠবে সেই জায়গাটিকেও তিনি হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। পশুপ্রেম ও জীবসেবার মতো জায়গাকেও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই জায়গাগুলিকেই দেখানোর চেষ্টা করবো।

Discussion
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বহু ছোটগল্পে আমি সামাজিক বেশ কিছু বিষয়কে খুঁজে পাই বারবার। আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই যে বিষয়টি মনে আসে, সেটি তাঁর একেবারে প্রথম দিককার গল্প সংকলন 'শ্বেত পাথরের টেবিল'। গল্প সংকলনের প্রথম প্রকাশের সময়কাল পাওয়া না গেলেও, এর প্রথম সংস্করণ হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। 'শ্বেত পাথরের টেবিল' গল্পটিতে মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রাধাণ্যই ফুটে উঠেছে। এবং তার সঙ্গে আছে দাম্পত্য কোলাহল ও টানাপোড়েনের ছবি। এই গল্পের প্রধাণ চরিত্র পরমেশ্বর। শ্বেতপাথরের টেবিলকে ঘিরেই পরমেশ্বর ও তুলসীর মধ্যে এক দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পরমেশ্বরকে বাড়ির প্রধাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার ভয়ে বাড়ির প্রতিটা মানুষই ভীত এবং নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত। পুত্র বঙ্কিমের কথায়-

> “বাবার দাপটে সংসারে মা ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। ছুটির দিনে মাকে জীবিত কোনও প্রাণী বলে মনে হত না। অনেকটা ছায়ার মতো নিজের কাজে ঘুরে বেড়াতেন। সারাদিন বাবাকে বার চব্বিশ চা করে দিতেন। বাবাকে চা দেওয়াও একটা কঠিন কায়দা ছিল। কাপের কানায় কানায় চা ভরে ডিশের উপর ব্যালেন্স করে আনতে হবে।”[১]

পরমেশ্বরের কথা মতোই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম চলবে, এমটাই যেন বাড়ির নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি তুলসি ও পরমেশ্বরের মধ্যে টানাপোড়েনের এক প্রতিচ্ছবিও উঠে এসেছে। পরমেশ্বর যাই বলুক না কেন, তুলসী সেই বিষয়টিকেই মেনে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রতিনিয়ত।

‘জুতা’, ‘মশারি’, ‘বায়োস্কোপ’ এই গল্প তিনটির মধ্যে দিয়ে মূলত সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ‘জুতা’ গল্পের গল্পকথককে আমরা দেখতে পাই, জুতা কেনা থেকে শুরু করে শেষ সময় পর্যন্ত এক গভীর চিন্তার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। গল্পকথের কথায়-

> “এত দাম দিয়ে আমার একজোড়া জুতো কেনা উচিত হবে কি না? আসলে আমি তখন আমার এই কেনার ব্যাপারে একটা জোরালো নৈতিক সমর্থন খুঁজছিলাম।”[২]

সেই সময় থেকেই গল্পকথক দোলাচলতায় ভুগতে শুরু করে। জুতা ছোট কি বড় এই নিয়েই যে সমস্যা, এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে বিলাসের তেমন জায়গা থাকে না বললেই চলে, সেখানে একটির পর দ্বিতীয় আরও একটি কিনে ফেলা অতটাও সহজ ব্যপার হয়ে ওঠে না।

‘মশারি’ গল্পেও এই একই সমস্যার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ‘মশারি’ গল্পে আমি অরিন্দম ও তাঁর স্ত্রীর মশারি কেনার যে ইচ্ছে তারই এক কাহিনি পাই। অরিন্দম ও তাঁর স্ত্রী রোজ সকালে স্বপ্ন দেখে নতুন ঝলমলে মশারির। একদিন অরিন্দম ও আরতির স্বপ্নপূরণ হয়। তাদের কাছে সেই মশারি পেয়ে মনে হয়েছিল-

> “আকাশি রঙের মশারির ভিতর যেন আরব্য রজনী আটকা পড়েছে।”[৩]

এই মশারিকে ঘিরে এক অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে গল্পকার এক মধ্যবিত্ত সমাজের ছবিকেই তুলে ধরেছেন। অল্প পাওয়ার মধ্যেই যারা খুশির জোয়ারে ভেসে যায়। অরিন্দমের কথায়-

> “আমি জেগে জেগে গভীর রাতের মশারি, শেষ রাতের মশারি, ভোরের মশারি দেখলুম। মনে হল যেন স্বপ্নরা ঘরময় পায়চারি করছে।”[৪]

নতুন মশারি কেনার আগে অরিন্দম আর আরতি বারবার নানা রকম উপায়ে তাদের পুরানো মশারিতেই তালি দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিনকে অতিবাহিত করেছে। আর স্বপ্ন বুনেছে একটা নতুন মশারির, যার মধ্যে কাটবে তাদের সন্তান সহ সুখী দাম্পত্যজীবন। কম পয়সায় কোথায় ভালো মশারি পাওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে অরিন্দমকে বহুবার বহুমানুষ নানান ভাবে উপদেশ দিয়েছে। টাইপিস্ট কালীবাবু অরিন্দমকে বলেছিল-

> “মেদেনীপুরে ভালো থান তৈরি হয়। ড্যাম চিপে। তার ছেলে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। গোটা তিরিশেক টাকা ছাড়। ছেলে আবার যখন ফিরবে একটা থান সস্তায় নিয়ে আসবে। একটা প্রমাণ সাইজের মশারি তো হবেই, সঙ্গে আর একটা ছোট বেবি মশারি বেরিয়ে আসবে।”[৫]

‘বায়োস্কোপ’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে আমি বর্তমান সমাজের এক ভিন্ন দিককে খুঁজে পাই। বর্তমানে মানুষ তার ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনকে এক করে ফেলছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান সমস্যার। এখানে বঙ্কু তার অফিসের কাজকে কামাই করে বন্ধু সুধরেকে নিয়ে সিনেমা দেখতে এসে তার অফিসের বসের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় সে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। সে চাকরি চলে যাওয়ার চিন্তায় কেঁদে উঠেছে। সুধরে, প্রথমে বঙ্কুর এই সমস্যা বুঝতে না পেরে বলে ওঠে-

> "কান্নার কী আছে? ওই কাবলিওয়ালা দেশে ফিরে যাবে। সেখানে তার বউ আছে, মেয়ে আছে, ঘর বাড়ি আছে। আখরোট পেস্তা বাদাম হিং সুরমা আছে।"[৬]

সব কিছু শোনার পরে বঙ্কু জানায়-

> "ওরে আমি কাবলিটার দুঃখে কাঁদছি না। আমার চাকরি চলে গেছে।"[৭]

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বঙ্কু, যেখানে শত প্রতিকূলতার মাঝে দাঁড়িয়ে একবার চাকরি পাওয়ার পর, সেই চাকরি চলে গেলে তার কি হবে, এই ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে। সমাজব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের স্বস্তির দিকগুলোও যেন, খানিকটা কমে আসতে শুরু করেছে।

'কুকুর হইতে সাবধাণ' গল্পের মধ্যে দেখতে পাই, রত্নেশ্বর বহু কষ্টে তার বাড়িকে স্বপ্নের মতো তৈরি করতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের সর্বদা খাওয়াদাওয়ার যোগান করতে গিয়েই দিনফুরোয়, সেখানে সখটা খানিকটা যেন নিছক হয়ে ওঠে। সেই কারণেই রত্নেশ্বরের-

> "আড়াই তলা বাড়ি সৌন্দর্যের সমস্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে অর্ধসমাপ্তই রয়ে গেল। তবু নিজের বাড়ি।"[৮]

'বাঘমারি' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'বাঘমারি' গল্পে সমাজের একটি অংশকে তুলে ধরা হয়েছে। জায়গাটা ভীষণ সামান্য, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীদের অবস্থান স্পষ্ট রূপে উঠে এসেছে। গল্পে আমরা চার বন্ধুর যে নাম পাই, তা হল- অমল, বিমল, কমল ও পরিমল। তাদের একজন একটা কিছু বললে, পরের জনের প্রতিউত্তর না করে শান্তি নেই। বিমলের মতে বাঘ নয় "প্রাণী জগতে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র।"[৯] বিমলের কথা শুনে পরিমল জানায়, সে নিজে বাঘকে আলোচালের হবিষ্যি খেতে দেখে। পরিমলের কথা অনুসারে সেই বাঘটি ছিল বিধবা বাঘিনী। এই অংশে গল্পকার সেই সময়ের বিধবারা কিভাবে মাছ- মাংস না খেয়ে জীবন কাটাত আলোচালের হবিষ্যি খেয়ে, সেই প্রতিচ্ছবিকেই যেন বাঘিনীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই এগোতে থাকে গল্পের মোড়। গল্পকার খুব সামান্য একটি জায়গায় নারীদের সমাজগত অবস্থানের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'হেড স্যারের কান্ড'-এর প্রথম প্রকাশ বইমেলা ডিসেম্বর ১৯৯৫। আলোচ্য গল্প সংকলনে মোট দুইটি গল্প আছে। একটি 'রাবণবধ' আর অন্যটি হল 'হেডস্যারের সমাজসেবা'। 'হেডস্যারের সমাজসেবা' গল্পটির একটি সামান্য ছোট্ট অংশে একটা বাস্তবতার ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার এইভাবে-

> "এখন উত্তরের ছেলে স্কুলবাসে দক্ষিণে যায় পড়তে। পাড়ার স্কুলে ছাত্র নেই। মাছি তাড়াচ্ছে। লেখাপড়ার চেয়ে এখন বড় হয়েছে স্কুল। নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েকে যেভাবেই হোক ভর্তি করতে হবে। ফর্মের জন্য সাড়ে তিন মাইল লম্বা লাইন। একই সঙ্গে তিনজনের পরীক্ষা, বাবা, মা আর যে ভর্তি হবে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বাপ- মায়ের চোখে ঘুম নেই। কী হবে! চান্স পাবে তো! না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা মশাই বলতে পারেন, স্কুল পড়বে না ছেলে পড়বে।"[১০]

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সত্যিই এই দশা হয়েছে। স্কুলে পড়ার থেকে ভালো স্কুল ও ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলই এখন খুঁজে বেড়ায় ছাত্রের বাবা- মায়েরা। ছাত্রের সাথে সাথে বাবা- মা ও সেখানে প্রস্তুত হয়ে যায়, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। গল্পের চরিত্র কুমুদবাবুর পরিবারেও এমনই একটা ঘটনা চলছে, তার বিবরণ দিতে শুরু করেন এইভাবে-

> "সেই কেস তো আমার বাড়িতে চলছে। নাতনিকে ভর্তি করবে। কলকাতার কাউকে আর ধরতে বাকি নেই। শুধু লাটসাহেবই বাকি। নাতনিটাকে রোজ সাতসকালে তুলে টানতে টানতে শহরের সেই আর- এক প্রান্তের এক মিশনারি স্কুলে নিয়ে যায়। সকাল হলেই আমার ভয় করে। নিত্য ফাটাফাটি, লাঠালাঠি। এই হল না, ওই হলনা। মিস বলেছেন, আপনার ছেলে ক্লাসে কিছু করে না, মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। ভীষণ মুডি, লিখতে দিলে পেনসিল চিবোয়।"[১১]

এভাবেই চলতে থাকে ছোটো ছোটো শিশুগুলির প্রতি অবিচার। এবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা কথাই মনে আসে, রবীন্দ্রনাথ যে শিশুদের পাঠের জন্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে সমর্থন করেছিলেন, সেই সব কিছু যেন কোথায় তলিয়ে যেতে বসেছে। ভালো এবং আরো ভালোর পেছনে ছুটতে ছুটতে কি করলে ভালো হবে, মানুষ যেন সেটাই ভুলতে বসেছে। শিশু-কিশোরদের কথা চিন্তা করেই গল্পকার 'হেডমাস্টারের সমাজসেবা' গল্পের মধ্যে এই জায়গাগুলোকেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'উৎপাতের ধন চিৎপাতে' গল্পসংকলনের দ্বিতীয় গল্প হল 'বালির ওপর পোল'। আলোচ্য গল্পে গল্পকার জীবনবোধের এক গভীর আদর্শকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রের কথা বলতে গেলে খুব বেশি চরিত্র গল্পটিতে নেই। কেবল- কাকাবাবু, তাঁর ভাইপো। আর পরের দিকে আমরা পাই এক সাধুর কথা। সঙ্গে আর একটি চরিত্র- কাকাবাবুর বউদি। গল্পটির সময়কাল মাত্র সাতদিনব্যপী। এই সাত দিনের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে নানান ঘটনা। পরিবারের সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলো মন্দার হিলে। সেখানে গিয়েই কাকাবাবু তার ভাইপোকে নিয়ে হাঁটতে বের হন। এই হাঁটতে গিয়ে বেশ কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটে। প্রথমত, কাকাবাবুর কাছে যে পাঁচ শেলের বিরাট টর্চ ছিল, বিজ্ঞানীদের কথা উঠিয়ে পরীক্ষা করার জন্য কাকাবাবু এই টর্চটি ওপর থেকে ফেলে দেন। এবং তিনি তাঁর ভাইপোকেও পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন। তারপর টর্চ সুদ্ধ ভাইপো নাকি একসাথে উঠে আসবে। সেটা হবে আবার দড়ির সাহায্যে। এ প্রসঙ্গে কাকাবাবু, তার ভাইপোর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন-

> "কী বুঝলি? দেহের জোরে মানুষ সব পারে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে।"[১২]

কাকাবাবুর মনে মনে ছিল এক্সপিরিমেন্ট করার ইচ্ছে, তা বার কয়েক তার ভাইপোকে ভীত করে তুলেছিল। ভাইপোর কথায়–

> "আজ নিউটন হয়েছেন। সেদিন প্যাসকেল হয়ে আমাকে জলে ডোবাতে চেয়েছিলেন। জলের উর্ধ্বে চাপের পরীক্ষা হচ্ছিল! আমার পায়ে পায়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা কাকাবাবুর নজর এড়ায়নি। পালাচ্ছিস কোথায়, বলে খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন।"[১৩]

জীবনবোধ তৈরি করার জন্য কাকাবাবু, তার ভাইপোকে নানান কথা বলেছেন। যেমন- নিউটনের প্রসঙ্গ বারবার করে বুঝিয়েছেন, আবার তিনি এটিও বলেছেন-

> "মানুষের দুটো কাজ, বুঝলে, এক দেখে শেখা, আর এক ঠেকে শেখা। চল্ আমরাও দৌড়ই।"[১৪]

এরপর দৌড়তে দৌড়তে তারা হঠাৎ জানতে পারে এক বাঘ (শের) বের হয়েছে। এই সময় নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা পোলের এক পাশ থেকে অন্যপাশে দৌড়তে শুরু করে। পথের মধ্যে একজন বয়স্ক লোককে লাঠি হাতে দেখে তারা অবাক হয়ে যায়, এইখান থেকেই গল্পের মোড় যায় বদলে। রাস্তার মাঝের সেই বয়স্ক লোক কাকাবাবুকে তার ঝুলির মধ্যে তার বেশ কয়েকটি জিনিস দিতে বলেন। কাকাবাবু একবার নয়, দুই দুইবার তা দিয়েছিলেন। প্রথমবার, সেই বয়স্ক ব্যক্তি বলেন-

> "তোমাদের অহংকার, হিংসা, পাপচিন্তা, মনের মধ্যে যা যা ময়লা আছে, সব, সব ফেলে দাও এর মধ্যে।"[১৫]

আর দ্বিতীয়বার কাকাবাবু নিজেই বলেন-

> "শীত ফেলেছি, গ্রীষ্ম ফেলেছি, দুধ খাবার লোভ ফেলেছি। ভাল ভাল জামা কাপড় পরার ইচ্ছে, সব ফেলে দিয়েছি।"[১৬]

এরপর কাকাবাবু সাধুসঙ্গ নিয়ে, সাধুদের সাথে বাইরে বেরিয়ে যান। এই অহংকার, লোভ, পাপচিন্তা, হিংসা, এসব জিনিস যদি মানুষ তার মন থেকে ত্যাগ করে ফেলতে পারে, তাহলে সেই মানুষকে কখনও ভয়ের বা খারাপ কিছুর সম্মুখীন হতে হয় না। গল্পকার এই বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের সম্মুখে। কাকাবাবু এসব বিসর্জন

দিয়ে দিতে পেরেছিলন বলেই, মানবিক জীবন থেকে তিনি এক অন্য জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। গল্পের শেষে আমরা কাকাবাবুর নাম পাই বিকাশ। বিকাশকে পরিবারের লোকজন খুঁজে না পেয়ে মন্দার হিল থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে। কিন্তু, ফিরে আসার পরও বহুবার বহু মানুষ কাকাবাবুর খবর দিয়েছিল। কিন্তু কোন বারই কাকাবাবুকে হাতে হাতে ধরা সম্ভব হয়নি-

> "অনেকে তীর্থ থেকে ফিরে এসে বলেন, একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল, ঠিক বিকাশের মত দেখতে। অমনি আমারা ছুটি সেই তীর্থে। বেড়ানো হয় কিন্তু কাকাবাবুকে ধরা যায় না।"[১৭]

বিকাশের দাদা বাড়ি ফিরে এসে পুলিসের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু, কোন লাভ হয়নি। পুলিস জানায়-

> "মিস্টার, যে সাধু হয়ে গেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি কী করে! আমরা যে চোরই ধরি। সাধুকে কি ধরা যায়! তবু একটা ছবি দিয়ে যাবেন। তালাস করে দেখবো।"[১৮]

'নিজের ঢাক নিজে পেটালে' গল্পে বড়োমামা নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে চেয়েছেন। মাসিমা এই কথা শুনে প্রথমে বুঝেছিলেন, বড়োমামা বোধহয় ইলেকশনে দাঁড়াতে চাইছেন। এদিকে মেজমামা ভেবেছিলেন, দাদা বুঝি ধর্মগুরু হতে চান। কিন্তু, শেষে বড়োমামা নিজে মুখেই বলেছেন-

> "আমি নিজেই আমার জন্মদিন করবো। তোরা তো কেউ কিছু করলি না!"[১৯]

এই জন্মদিন নিয়ে গল্পের সূত্রপাত। বড়োমামা ভেবেছিলেন নিজের জন্মদিন তিনি নিজেই পালন করবেন এবং প্রচুর মানুষ খাওয়াবেন। কিন্তু, মেজোমামা বড়োমামাকে এক অভিনব বুদ্ধি দেন। কিছু আলাদা বা অভিনব করার বুদ্ধি। মানুষ নয়, পশুভোজন করানোর বুদ্ধি। মেজোমামার কথায় মানুষকে খাওয়ালে, তারা বদনাম করতে পারে। তাঁর কথায়-

> "লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগীমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।"[২০]

মেজমামার এই কথা শোনামাত্রই বড়োমামা ভীষণ খুশি হন, আর আনন্দের চোটে ভাইকে বলে ওঠেন-

> "তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।"[২১]

এরপর সবকিছুই ঠিক হয়ে গেল। বড়ো মামা ও মেজোমামা মিলেই সমস্ত কিছুর জোগাড় করবেন। প্রথমেই তাঁরা ঠিক করলেন কে, কি খাবে-

> "পাখির ভালো মন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচিলি, আখেড় গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা! কুকুরের হল মাংস।"[২২]

এরপর আমরা দেখতে পাই, বড়োমামা কোষ্ঠী নিয়ে বসেন নিজের জন্মের তারিখ বের করার জন্য। কারণ, বড়োমামা নিজেই নিজের জন্মের তারিখ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বড়োমামা তা খুঁজে না পেলে শেষে কবি করুণাকিরণ খুঁজে বের করে দিয়েছিলেন। করুণাকিরণ বড়োমামার চেয়ে বয়সে বড়। তিনি বড় বড় কবিতাও লেখেন। মাথায় বড়োবড়ো কাঁচাপাঁকা চুল। বড়োমামার কা এখন তিনি প্রায়ই আসেন। কারণ, শরীরে তাঁর হাজারটা ব্যামো। বড়োমামা যেভাবে বলেছেন-

> "কখনও পেট ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়োমামা খুব খাতির করেন। বিনা পইয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ।"[২৩]

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iii, July2022, tirj/July22/article-43
Website: www.tirj.org.in, Page No.389-399

ভাগ্নে বলে-

> "কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়োমামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিন জন্মেছে হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।"[২৪]

এই হল বড়োমামার কোষ্ঠী।

পাখির প্রসঙ্গ উঠতেই বড়োমামা অনেক রকম পাখির নাম শুনিয়েছেন মেজোমামাকে। যেমন- টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। অর্থাৎ সব জাতের পাখিকেই বড়োমামা চিহ্নিত করেছিলেন, এরা গান গাইতে পারে। বড়োমামা পাখিদের মধ্যেও শ্রেণীর বিচার করেছেন। ভালো-মন্দের বিচার করেছেন। এই বিচারের সাথেই তিনি যেন সমাজের বুকে টিকে থাকা এক দল নিম্নবিত্ত মানুষের সাথে বিত্তবান মানুষদের মেলাতে চেয়েছেন। কোন পাখি গান গায়, কোন পাখি বেশি সুন্দর ইত্যাদি নানা বিষয় কিন্তু বড়োমামা বলতে চেয়েছেন। বড়োমামার এই কথা মেজোমামা একবারেই পছন্দসই হয়ে ওঠেনি। মেজোমামা, বারবার দাদাকে এইসব কাটিয়ে উঠতে বলেছেন। মেজোমামার কথায়-

> "তোমার বড়দা বড়ো জাতিভেদ। বর্ণবৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।"[২৫]

আমাদের সমাজ থেকেও যদি একই ভাবে এই জাতিভেদ প্রথা উঠে যেত, তাহলে সমাজটা আরও উন্নত এবং সুন্দর হয়ে উঠতে পারত।

আলোচ্য গল্পে আমরা দুটো চিঠির প্রসঙ্গ পাই। এই চিঠি দুটোকেই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। দুটো চিঠিই বড়োমামার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতদের প্রতি। প্রথমটি ছিল পশুদের উদ্দেশ্যে আর দ্বিতীয়টি ছিল মানুষের উদ্দেশ্যে। দুটোই মেজোমামা লিখিয়েছিলেন ভাগ্নেকে দিয়ে। প্রথম চিঠিটা ছিল এই রকম-

> "সবিনয়ে নিবেদন,
> আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পশুভোজনসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরু/ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহনের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আর্শীবাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবায় সুযোগ দান করুন।
> --ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়"[২৬]

আর দ্বিতীয় চিঠিটা লেখা হয়েছিল সিদ্ধান্ত বদল করার পরে। পশুদের মালিকের সাথে মেজোমামার দেখা হওয়ার পর, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এত পশুর একসাথে রাখার জায়গার যেমন অভাব হবে, তেমনি মালিকদের কথামতো তাদের খোরাকের যে আয়োজন করতে হবে, তা পয়সার কথা না ভেবে করা গেলেও, রাখার জায়গা মনে হয় দেওয়া সম্ভব হবে না। এর ফলে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হওয়ায় দ্বিতীয় চিঠির আগমণ ঘটে। এই চিঠিটিও মেজোমামা, ভাগ্নেকে দিয়েই লিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয় চিঠিটি হল এইরকম-

> "সবিনয়ে নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।"[২৭]

তবে, মেজোমামা আরেকটি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, সেটি হল পশুপ্রেমী বড়দার নামে ভালো ভালো কথা লিখে একটি বই ছাপিয়েছিলেন। বইটির নামও দিয়েছিলেন 'পশুপ্রেমী বড়দা'। এরপর যেটা ঘটে, সেটি হল- অনুষ্ঠানের দিন এসে যায়। সমস্ত আয়োজন ও হতে শুরু করে, লোকজনের সমাগম হয়, কিন্তু এই বইয়ের পরিবর্তনের কথা আর কারোরই মনে থাকে না। সকলেই যখন খেতে বসে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে একজন হঠাৎ এসে এই

বই পড়ে শোনাতে শুরু করে, ফলে সকলের ভীষণ অপমানিত বোধকরে আর অনুষ্ঠান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তার কারণ হল, এই বইতে সবই লেখা ছিল পশুদেরকে নিয়ে। মানুষকে নিয়ে তো কোথাও কিছু লেখা ছিলো না। ফলে অপমানিত হওয়াও ছিল ভীষণ স্বাভাবিক। সেই বইয়ের কিছুটা অংশ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি-

> "শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা দেখেছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।
> সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই পশুভোজন সভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল কুকুর সেবা করছে। আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।"[২৮]

এই কথা শোনা মাত্রই সকলে সমস্বরে 'অপমান, অপমান!' করে চিৎকার করে ওঠে। মেজোমামা সকলের সামনে হাত জোড় করে বলে ওঠেন-

> "ছি ছি, ভুল বুঝবে না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, পোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।"[২৯]

আর বড়োমামা বলে ওঠেন-

> "এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি। লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।"[৩০]

আর এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

এই গল্প সংকলনের আরও একটি গল্প 'তেঁতুল গাছে ডাক্তার'। এই গল্পে আমরা অনেকগুলো চরিত্রকেই পেয়েছি। কিন্তু এখানে আমরা বড়োমামার মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা আগাগোড়াই বড়োমামা চরিত্রটি যখন প্রথম দিককার গল্পের মধ্যে পেয়েছিলাম, তখন থেকেই জানি যে বড়োমামা ডাক্তার। সেই হিসাবে, তার রোগীরাও তাকে সবসময়ই প্রায় ঘিরে রাখে এবং শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু এই গল্পে আমরা অন্য দুই একটি দিককেও খুঁজে পেয়েছি। প্রথমত, মেজোমামার পোষা পাখি বড়োমামা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রথমে এবং পরে তা সত্যিই উড়িয়ে দিয়েছেও। এই পাখির প্রসঙ্গ উঠতেই বড়োমামা বলেছে—

> "যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরান-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় ছটফট করছে।"[৩১]

এই পাখির প্রসঙ্গ উঠতেই রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দুইপাখি' কবিতাটির কথাই মনে এসেছে বারবার। কিন্তু বড়মামা পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ার পরও দেখা গেছে, পাখিটি খাঁচা থেকে উড়ে যায়নি। সে সেখানেই বসে আছে। এই অবস্থা দেখে বড়োমামা নিজেই বলে ফেলেছেন-

> "স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালি পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বদ্ধ জীবনই বেশি ভালোবাসে।"[৩২]

বড়োমামা যেন সমাজে বিভিন্ন বাঁধনে বদ্ধ বাঙালি জাতিকে কটাক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, বড়োমামার কথা অনুসারে পাখিগুলোর অবস্থা নাকি মানুষের মতোই হয়েছে, স্বাধীন করে দিলেও নাকি স্বাধীন হতে পারছে না। বড়োমামা নিজেই বলেছিলেন'

> "আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায়না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়।"[৩৩]

বড়োমামার কথা থেকে পাখির সাথে সাথে বারবার মানুষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে বারবার এই গল্পের মধ্যে দিয়ে। বড়োমামা পাখিটি উড়িয়ে দেওয়ার পর সে বাড়ির কুকুর লাকির মুখে যখন পরে, তখন বড়োমামার নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে। বড়োমামা ধরা ধরা গলায় বলে উঠেছেন-

"আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।"[৩৪]

'গরুর রেজাল্ট' গল্পে আমরা লক্ষ্মীনামের একটা গরুকে পাই। সেই গরুর প্রসঙ্গে বড়োমামা, মেজোমামা, মাসিমা প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। যেমন মাসিমা বলেছিলো-

"লক্ষ্মী খুব চালাক গরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোন্‌টার পর কী খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুরেছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এর পরই হয়ত আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচা লঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।"[৩৫]

কিন্তু, মেজোমামা বলেছিলেন-

"শিশু আর গরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই মুখে পুরবে। যতরকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গরু এক জিনিস, সেম থিঙ্গস, চেহারা ছাড়া সব সমান।"[৩৬]

একটা সময় লক্ষ্মীর দুষ্টুমি দেখে মাসীমার কথায় যখন লক্ষ্মীকে অন্য কারোর হাতে তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছিল, সেই সময়েই ঘটলো এক বিরাট সমস্যা। বড়োমামা লক্ষ্মীকে রতনের হাতে তুলে দেওয়ার পরই যেটা ঘটেছিল সেটা হলো, লক্ষ্মীকে দেখেই রতন প্রথম বলেছিল-

"বাঃ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি! গরু হলে এইরকম চেহারা হওয়াই উচিত।"[৩৭]

পরে যখন রতন গরুর থেকে কি পেতে পারি আর কি তৈরি হতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলো, তখন যেন বড়োমামার চোখ এমনিতেই খুলে যায়। কারণ বড়োমামা রতনকে লক্ষ্মীর প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছেন, তার উত্তরে রতন হঠাৎ করে বলে ওঠে-

"হাসালেন ডাক্তারবাবু, ও তো এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা- ফেয়ারা বুঝি না, আমি বুঝি দুদ্। দুদ্ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।"[৩৮]

এই কথা শুনে বড়োমামা ভেবেছেন, রতন হয়তো গোরুকে জুতো পেটা করতে চায়। কিন্তু রতন আবারও বলে ওঠে-

"না না, হিন্দুর ছেলে গরুকে জুতো মারতে পারি? মহাপাপ! গরু মেরে জুতো তৈরি হবে।"[৩৯]

এই কথা শোনা মাত্রই বড়োমামা আঁতকে ওঠেন। বড়োমামার অবাক হওয়াতে রতন বলে ওঠে-

"অবাক হবার কি আছে!' ... 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে? লাখ্-লাখ্ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গরু বড় উপকারী জন্তু! ...এই দেখুন চামড়া, কমসে কম একশো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক শিরিস তৈরি হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গরু কি মানুষ? মরল আর পুড়ে ছাই হল?"[৪০]

হিন্দুদের গরুর ওপর একটা দুর্বলতা চিরকাল। কারণ, হিন্দুরা গরুকে দেবতা হিসাবেই মেনে এসেছে। মানুষের এই চিরাচরিত ভাবনায় বাস্তবের নির্মম দিকটি তুলে ধরেছেন গল্পকার। গরু বলতে যে মানুষ বোঝে অন্য কিছু, বড়োমামার কথায় তাই যেন উঠে এসেছে-

"আমরা কত স্বার্থপর দেখ? গরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই রসগোল্লা, গব্যঘৃত, ফুলকো লুচি!"[৪১]

সুখে থাকতে ভূতে কিলানো' গল্পে আমরা আবারো পেয়ে যাই মামাদের। অর্থাৎ বড়োমামা ও মেজোমামাকে। আমরা আগেও বেশকিছু গল্পের মধ্যে দেখেছি, বড়োমামা পেশাগত দিক থেকে ডাক্তার হলেও সমাজসেবার একটা মানসিকতা বড়োমামার মধ্যে সর্বদাই দেখা যায়। তাতে হয়তো, বড়োমামাকে অনেকসময়ই অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

কিন্তু, বড়োমামাকে এইসব কিছুকে নিয়ে ভাবতে দেখা যায়নি কখনো। এই গল্পেও আমরা দেখতে পাই, বড়োমামা দরিদ্রসেবা করতে চেয়েছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন মহান, মহৎ, অসীম ও অনন্ত। তাই তিনি খুলতে চেয়েছিলেন লঙ্গরখানা। শুধু তাই নয়, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেও ফ্রিতে সেবা করতে চেয়েছিলেন। বড়োমামার কথায়-

> “রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি তৈরি করে দুপুরবেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রি চিকিৎসা চালাব। একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে- হেঁ হেঁ!”[৪২]

এভাবেই বড়োমামা সকলের পাশে থাকতে চেয়েছেন সর্বদা। কত সাধারণ মানুষ খেতে পায়না। কত কষ্টে দিন কাটায়। বড়োমামার কথায়-

> “পয়সার কি জ্বালা। কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিসকুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। উৎপাতের ধন এইভাবেই চিৎপাতে!” [৪৩]

এভাবেই কিন্তু বড়োমামা সমাজের বাস্তব রূপটিকে বারবার পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আরও একটি সমাজের বাস্তব দিক গল্পটিতে উঠে এসেছে, সেটি হল, বড়োমামার কাঙাল ভোজনের জন্য প্রথম দিন আমন্ত্রিত ছিল পঁচিশ জন। সেখানে যখন আমরা দেখি একসাথে বহু মানুষ এসে পৌঁছেছে। তখন বড়োমামা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কি করা উচিত আর কি উচিত নয়। কারন, পঁচিশ জনের বেশি মানুষের আয়োজন সেখানে ছিল না। বড়োমামা যখন চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের। সেই কথা শোনা মাত্রই প্রত্যেকে চিৎকার করে উঠে বলেছিল ‘আমি সেই পঁচিশ জনের একজন’। এরপর বড়ো মামা বলে ওঠেন-

> “তা কী করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটের প্যান্টসার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।”[৪৪]

এরপর সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই চিৎকার উঠেছিল-

> “আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।”[৪৫]

অর্থাৎ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লঙ্গরখানায় খেতে আসা মানুষগুলোর মধ্যে মডার্ন গরিব বলতে ঠিক কাকে বোঝাতে চেয়েছেন, এটা কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়। আমাদের বর্তমান সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা শিক্ষাগত দিক থেকে যোগ্য হয়েও সমাজে কোন কিছুই করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারছে না। ফলে, তাদের বেকারত্ব যেন প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। সমাজের এই বাস্তব সত্যটিকেও যেন গল্পকার আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন হাস্যচ্ছলে। এই ভাবেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বাস্তবের বহুকৌণিক দৃষ্টিকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’, ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ.১৩

২. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’, ‘জুতা’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৭৭

৩. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’, ‘মশারি’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৯০

৪. তদেব, পৃ. ৯১

৫. তদেব, পৃ. ৮৮

৬. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’, ‘বায়োস্কোপ’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১১১

৭. তদেব, পৃ. ১১১
৮. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'শ্বেতপাথরের টেবিল', 'কুকুর হইতে সাবধান', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ১১৩
৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'বাঘমারি', 'বাঘমারি', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ১১
১০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'হেডস্যারের কান্ড', 'হেডস্যারের সমাজসেবা', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৭১
১১. তদেব, পৃ. ৭১
১২. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'উৎপাতের ধন চিৎপাতে', 'বালির ওপর পোল', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ২২
১৩. তদেব, পৃ. ২৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৭
১৫. তদেব, পৃ. ৩১
১৬. তদেব, পৃ. ৩৫
১৭. তদেব, পৃ. ৩৭
১৮. তদেব, পৃ. ৩৭
১৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'উৎপাতের ধন চিৎপাতে', 'নিজের ঢাক নিজে পেটালে', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৩৮
২০. তদেব, পৃ. ৩৮
২১. তদেব, পৃ. ৩৯
২২. তদেব, পৃ. ৩৯
২৩. তদেব, পৃ. ৩৯
২৪. তদেব, পৃ. ৩৯
২৫. তদেব, পৃ. ৪৩
২৬. তদেব, পৃ. ৪৯
২৭. তদেব, পৃ. ৪৯
২৮. তদেব, পৃ. ৫১
২৯. তদেব, পৃ. ৫১
৩০. তদেব, পৃ. ৫১
৩১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'উৎপাতের ধন চিৎপাতে', 'তেঁতুল গাছে ডাক্তার', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৮৩
৩২. তদেব, পৃ. ৮৫
৩৩. তদেব, পৃ. ৮৬
৩৪. তদেব, পৃ. ৮৬
৩৫. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'উৎপাতের ধন চিৎপাতে', 'গরুর রেজাল্ট', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৫
৩৬. তদেব, পৃ. ১৩৫
৩৭. তদেব, পৃ.১৩৬

৩৮. তদেব, পৃ.১৩৬

৩৯. তদেব, পৃ.১৩৬

৪০. তদেব, পৃ.১৩৫

৪১. তদেব, পৃ.১৩৫

৪২. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'উৎপাতের ধন চিৎপাতে', 'সুখে থাকতে ভূতে কিলানো', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১৮০

৪৩. তদেব, পৃ. ১৮২

৪৪. তদেব, পৃ. ১৯১

৪৫. তদেব, পৃ. ১৯১